

বাংলা ভাষার বরেণ্য কবি ও
সব্যসাচী লেখক সৈয়দ
শামসুল হক। এক বর্ণাঢ্য ও
কর্মমুখর জীবন শেষে গত
২৭ সেপ্টেম্বর তিনি যাত্রা
করেছেন অনন্ত মহাজাগতিক
সফরের পথে। জাতি হারাল
এক ক্ষণজন্মা কীর্তিমান
প্রতিভা, কোয়ান্টাম হারাল
একজন প্রকৃত শুভকাজক্ষী।

সদ্যপ্রয়াত কবি সৈয়দ

হক ছিলেন সত্যিকার অর্থেই ভালবাসার
এক অনন্য প্রতিকৃতি। তার পুরো
জীবনজুড়ে এ ভালবাসা আর নিষ্ঠা
আমরা দেখতে পাই সাহিত্যের প্রতি,
মানুষের প্রতি এবং সর্বতোভাবেই তার
প্রিয় দেশ ও জাতির প্রতি।

আমরা অত্যন্ত আনন্দের সাথে
স্মরণ করি, এ বছরের মার্চে ঢাকায়
অনুষ্ঠিত কোয়ান্টাম মেথড কোর্স চলমান
৪০০ ব্যাচে অংশ নেন কবি সৈয়দ হক।
কোর্স-প্রত্যয়নে তিনি সেদিন উপস্থিত
সবাইকে শোনান তার অনবদ্য ও
হৃদয়স্পর্শী অনুভূতি। অনুপ্রেরণামূলক
সেই বক্তব্যে উঠে আসে তার জীবনের
এক অসামান্য দায়িত্ববোধের বাস্তব
দৃষ্টান্ত।

১৯৫৪ সালে তার পিতার
আকস্মিক মৃত্যু হয়। মাত্র ১৮ বছর
বয়সে সে বেদনার রেশ না কাটতেই
সৈয়দ শামসুল হক উপলব্ধি করলেন,
পরিবারের জ্যেষ্ঠ সন্তান হিসেবে
বয়ঃকনিষ্ঠ সাত ভাইবোনের দায়িত্ব
সেদিন থেকে স্বভাবতই তার কাঁধে।
কিন্তু শোকবিধ্বস্ত সেই দিনটিতে তিনি
একবারের জন্যেও মনে ঠাঁই দেন নি
কোনো ধরনের নেতিবাচকতা। বরং
এক দুগুণ ইতিবাচকতায় তিনি নিজের
কাছেই প্রত্যয় ব্যক্ত করেছিলেন যে,
তিনি পারবেন।

তিনি পেরেছিলেন। কারণ
তিনি দায়িত্ব নিয়েছিলেন।
আসলে ভালবাসা মানে
যে দায়িত্ব নেয়া—
এ দায়িত্ব
নিজের
প্রতি,

ভালবাসার প্রতিকৃতি সৈয়দ শামসুল হক

পরিবারের প্রতি, সমাজ ও দেশের
প্রতি—তারই প্রতিচ্ছবি ফুটে ওঠে তার
প্রত্যয়ী দৃষ্টিভঙ্গিতে। তার জীবনের
সকল পর্যায়ে আমরা দেখতে পাই এ
ইতিবাচকতা, বিশ্বাস ও উদ্যমের
একাধিক দৃষ্টান্ত। আর সে কারণেই
তিনি সত্যভাষণে সবসময়ই থাকতে
পেরেছেন অকপট।

সাহিত্যের যতগুলো শাখায় আমৃত্যু
বিচরণশীল ছিলেন সৈয়দ হক, সর্বত্রই
আমরা দেখি তার সেই একই কণ্ঠস্বর।
বাংলা ভাষা, এদেশের মানুষ ও প্রকৃতি,
আমাদের মহান মুক্তিসংগ্রাম ও প্রিয়
মাতৃভূমির প্রতি তার অকৃত্রিম ভালবাসা
ও দায়িত্ববোধের
প্রকাশ তিনি

ঘটিয়েছেন তার সাহসী চেতনায় ও
সুঠাম ভাষ্য—কবিতায় গল্পে নাটকে
উপন্যাসে গানে চলচ্চিত্রে, যা গত ছয়
দশকেরও বেশি সময় ধরে দেশের
পাঠকগোষ্ঠীকে আক্ষরিক অর্থেই উদ্বুদ্ধ
করেছে মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত চেতনায় ও
দেশপ্রেমে।

দেশ ও মানুষের প্রতি তার অকৃত্রিম
ভালবাসা, দায়িত্ববোধ ও গভীর
অন্তর্দৃষ্টিপ্রসূত লেখনীর গুরুত্ব কোয়ান্টাম
ফাউন্ডেশন অনুভব করেছে সবসময়ই।
তাই তো এক চিরায়ত আধ্যাত্মচেতনায়
রচিত তার *হায় রে মানুষ রঙিন ফানুস/*
দম ফুরাইলে রুঁসু গানটির প্রসঙ্গ

কোয়ান্টাম মেথড কোর্সের একটি
আলোচনায় উল্লেখ করা হচ্ছে
সেই ১৯৯৩ সাল থেকেই,
৪০০টিরও বেশি কোর্সে।

দু-য়ুগের এই
অসামান্য কৃতজ্ঞতাস্বরূপ
কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন
বান্দরবান লামার
কোয়ান্টামমন্ড
সাংস্কৃতিক মঞ্চের
নামকরণ করে *সৈয়দ*
হক মঞ্চ নামে।

আমরা স্মৃতিচারণ
করি নভেম্বর
২০১৫-তে

সপরিবারে কবির
কোয়ান্টাম সফরের
দিনগুলোর। এ সফরে
৫ নভেম্বর সন্ধ্যায় কবি
স্বহস্তে *সৈয়দ হক মঞ্চের*
নামফলক উন্মোচন করেন।

কোয়ান্টামের দেড়
য়ুগের ইতিহাসে অভূতপূর্ব
সেদিনের সে অনুষ্ঠানের
প্রতিটি পর্বে সৈয়দ শামসুল
হক গভীরভাবে আপ্ত হন।

আবেগসিক্ত বক্তৃতায় তিনি বলেন, ‘যে
মানুষের জন্যে আমি সারাজীবন
ভেবেছি, যাদের এতটুকু মঙ্গলের জন্যে
৬৪ বছর ধরে লিখছি, সেই মানুষের
সামনেই যেন ৬৪টি ধাপ পেরিয়ে
আমাকে একটি শীর্ষ অবস্থানে পৌঁছে
দিল আজকের এই ঘটনা।

... একটু আগে যখন মঞ্চের নাম
ঘোষণা করা হলো তখন আমি কেঁদে
উঠেছিলাম। আমার চোখ দিয়ে দরদর
করে পানি পড়ছিল। আমার মনে হলো,
এ তো পুরস্কার নয়। মানুষ আমাকে
স্পর্শ করল। জীবন আমাকে স্পর্শ
করল। সত্য আমাকে স্পর্শ করল। বাণী
আমাকে স্পর্শ করল। বলল, হাঁ, তুমি
যা করেছ সত্যের জন্যে করেছ। দেশের
জন্যে করেছ। এবং এই দেশ, এই
মাটি, এই আকাশ, এই খোলা প্রকৃতি
তোমাকে আজ পুরস্কৃত করছে।

... এই মঞ্চ বহু অনুষ্ঠান হবে।
এই মঞ্চ এই খোলা আকাশের নিচে
ঘুমিয়ে থাকবে না। এখানে প্রাণ জেগে
উঠবে। এখানে সত্যের উচ্চারণ হবে।
এখানে মানুষের কলকণ্ঠে জীবনের
বন্দনা আমরা শুনতে পাব। আমি তার
দিকে কান পেতে থাকলাম। আমি
যেখানেই থাকি আমার প্রাণ এখানেই
রয়ে গেল।’

এর আগেও রক্তদান কার্যক্রম ও
ইথেরজি মেডিটেশন সিডি উদ্বোধনসহ
কোয়ান্টামের বেশ কয়েকটি অনুষ্ঠানে
এসেছিলেন সৈয়দ শামসুল হক।

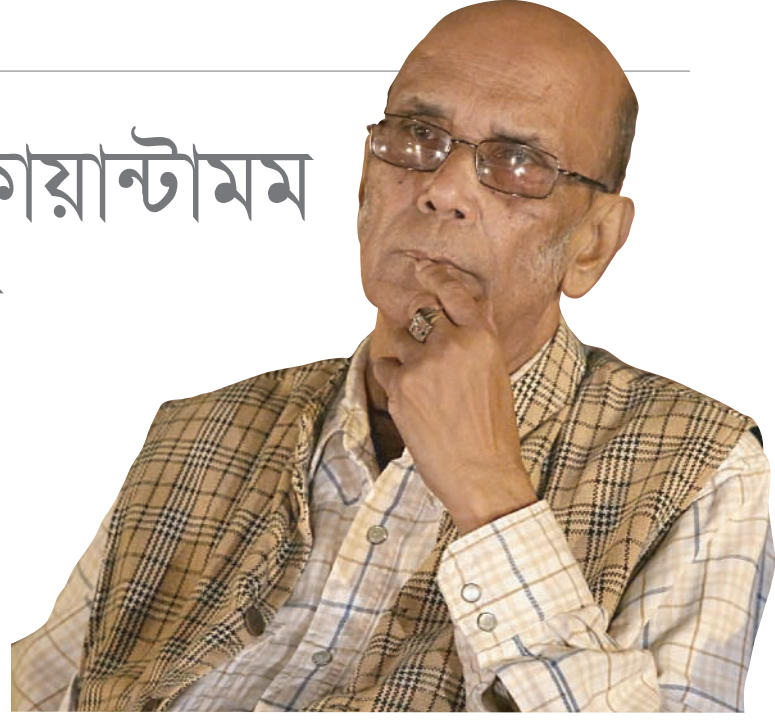
ফাউন্ডেশনের বিভিন্ন সেবামূলক
কার্যক্রম সম্পর্কে জ্ঞাত হয়ে
জানিয়েছিলেন তার ঐকান্তিক
শুভকামনা ও ভালবাসা।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে
সর্বোপরি আমাদের জাতীয়
জীবনে কবি ও সব্যসাচী
লেখক সৈয়দ শামসুল হকের
সামগ্রিক অবদান আমরা
গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ
করি। আমরা তার আত্মার
অনন্ত প্রশান্তি কামনা করি।

সব্যসাচী লেখক সৈয়দ শামসুল হক স্মরণে বিশেষ সংখ্যা

স্বপ্নে কর্মে উদ্যমে কোয়ান্টামম আরো বিকশিত হোক

সৈয়দ শামসুল হক



আমি লেখক হতে চেয়েছিলাম। বাবা চেয়েছিলেন আমি ডাক্তার হই। কারণ তখনকার দিনে মনে করা হতো—লেখক হলে লোকটা উদ্ভ্রান্ত হবে, দরিদ্র থাকবে, তার কোনো উপার্জন থাকবে না, সে যন্ত্রায় ভুগে মারা যাবে ইত্যাদি। এটা হচ্ছে আসলে একটা সামাজিক কল্পনা। সামাজিক কল্পনা সব মানুষকে চিরদিনের দাঁতের মতো সমান দেখতে চায়। কেউ একটু বেড়ে গেলেই ছেঁটে দিতে চায়। আর এখানেই আসে নিজের জীবনের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়ার প্রশ্ন। আসে ঝুঁকি নেয়ার প্রশ্ন।

ঝুঁকি নিতে হয়। আমি দেখেছি যেখানে যা-কিছু বড় কাজ হয়েছে, সবাই কোনো না কোনো ঝুঁকি নিয়েছেন। সবকিছু নিরাপদ নির্বিঘ্ন থাকবে, তারপর আমি একটা মহৎ কাজ করব, এটা হয় না।

কোয়ান্টামমে এসে মনে হচ্ছে আমার বন্ধু শহীদ আল বোখারী মহাজাতকও এখানে এত সব কার্যক্রমের সূচনা করেছেন, তিনিও ঝুঁকি নিয়েছিলেন। তাই তিনি পেরেছেন।

রবীন্দ্রনাথ বলতেন, শিক্ষা চার দেয়ালের মধ্যে নীরস কাঠের বেষ্টিতে বসে নয়, প্রকৃতির মাঝে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। আমার খুব ভালো লাগছে যে, এখানে বাঙালি ও ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর হাজারেরও বেশি ছেলেমেয়ে প্রকৃতির কোলে বড় হচ্ছে। মানুষ তো স্বর্গ কল্পনা করে, আবার স্বর্গ সৃষ্টিও করে। এটা পৃথিবীর বুকে একখণ্ড স্বর্গ বলেই আমার কাছে মনে হচ্ছে।

কোয়ান্টামমের প্রকৃতিতে এত রঙের বৈচিত্র্য, এখানে এত মানুষের বৈচিত্র্য, অভিজ্ঞতার বৈচিত্র্য—এটা এককথায় অনন্য। বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়েই তো সত্যের সন্ধান করতে হয়। সত্যকে খুঁজ পতে হয়। আর সেজন্যে চাই দেখার চোখ। সেই চোখটা থাকলে, অন্তত আর কিছু না হোক, জীবনটা সহজে বহনযোগ্য মনে হয়। অনেকে যেমন বলেন, জীবনটা খুব ভার হয়ে গেল, আর পারি না—ওটা হয় না।

যেমন, এই যে কোয়ান্টামমে এসেছি, এখানকার প্রকৃতি পরিবেশকে গভীরভাবে উপলব্ধি করছি, এতে কদিন ধরে নিজেকে বেশ হালকা লাগছে। তেমনি পারিপার্শ্বিক নানা বৈচিত্র্যগুলোকে যখন ধারণ করা যায় তখন জীবনও খুব উপভোগ্য হয়ে ওঠে। তা না হলে এ জীবন একটা বোঝা ছাড়া কিছু নয়।

আমি আমার একটা ছড়াতে কথাটা বলার চেষ্টা করেছিলাম, যার সারমর্ম হলো, গর্দভ সারাজীবন চিনির বোঝা টেনে যায়। কিন্তু একবার তা চেখে দেখার জন্যেও সে ঘাড়টা ঘোরাই না—দেখি তো একটু, কী বইছি! এই হচ্ছে অধিকাংশ মানুষ। কেবল বোঝা টেনেই যাচ্ছে।

অথচ চারপাশের প্রকৃতি, মানুষ ও জীবনের বৈচিত্র্যকে বুঝতে পারলে জীবন কত আনন্দময়! আজ সকালেই, ঘুম ভেঙে যখন রাহমাতানের বারান্দায় এসে দাঁড়িলাম, খুব ভালো লাগল। হঠাৎ মনে হলো, কোরআনে আল্লাহ ভোরের শপথ করেছেন। অর্থাৎ নিজের সৃষ্টিতে তিনি এতই মুগ্ধ হয়েছেন যে, ভেবেছেন, এর নামেও শপথ করা যায়, তাহলে সত্যটা বোঝানো যাবে।

তবে মানুষের জন্যে মুগ্ধতা খুব ভালো কিছু নয়। মুগ্ধ হলেই প্রশ্ন থেমে যায়। মানুষ তখন বিবশ হয়ে যায়। প্রশ্ন করার প্রবৃত্তিই তার আর হয় না। কিন্তু প্রশ্নই তো হচ্ছে সত্য অনুসন্ধান ও আবিষ্কারের প্রধান উপায়।

বড় বড় ধর্মপ্রচারকেরা প্রশ্ন করেছেন। মহান সাহিত্যিকেরা জীবন সম্পর্কে প্রশ্ন করেছেন। সজেক্টিস বলতেন, প্রশ্নের মধ্য দিয়ে তুমি তোমার উত্তর পাবে। এবং উত্তরটা তোমার ভেতরেই আছে। মহাজাতকের কথা এবং তার লেখায়ও আমি এই দর্শনগুলো দেখতে পাই—মানুষের ভেতরেই রয়েছে এক অসীম শক্তির আধার, একে জাগ্রত করলেই আমি আমার জিজ্ঞাসার উত্তর পাব।

কোয়ান্টামমের প্রাণপুরুষ শহীদ আল বোখারী মহাজাতক, যাকে সবাই গুরুজী নামে চেনে, তার সাথে আমার বন্ধুত্ব ৪০ বছরেরও বেশি সময় আগের। ১৯৭৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসের কথা। আমি তখন লন্ডনে থাকি, বিবিসি-তে

কাজ করি। ডিউটি ট্যুরে সপ্তাহ দুয়েকের জন্যে দেশে এসেছি। সে-সময় শাহাদাত চৌধুরী সম্পাদিত *বিচিত্রা* পত্রিকার অফিসে একদিন তার সাথে আমার দেখা ও পরিচয়। তার পরনে তখন কালো ফতুয়া, কালো পাজামা। স্মিত চেহারা ও মিষ্টি হাসিতে স্নিগ্ধদর্শন একজন মিতভাবী মানুষ। সেই দিনটি থেকেই আমাদের বন্ধুত্বের সূত্রপাত।

১৯৭৬ সালে ছুটিতে আবার দেশে এলাম। *বিচিত্রা*-য় প্রায়ই আমাদের দেখা হতো। নানা বিষয়ে কথা হতো, গল্প হতো, যদিও তিনি বরাবরই ক্ষীণভাবী। সামগ্রিকভাবে তখন দেশের অবস্থা খুব একটা ভালো নয়, মানুষের মন ভারাক্রান্ত। অনেকেই নানা কারণে হতাশ। এর মধ্যেও দেখতাম, মহাজাতক প্রায়ই বলতেন, একটা পরিবর্তন আসবে। সময় বদলাবে। এভাবে চলতে পারে না।

তার কথাগুলো আমার ভালো লাগত। তার দিকে আমি একটা আকর্ষণ বোধ করতাম। তিনিও আমাকে পছন্দ করতেন। এরপর মাঝখানে বহুদিন আর নিয়মিত দেখা-সাক্ষাৎ নেই। তিনি তার কাজ করছেন, আমি আমার কাজে ব্যস্ত। মাঝেমাঝে হঠাৎ কোথাও দেখা হয়। এভাবেই চলছিল।

কয়েক বছর আগে কোয়ান্টামম ফাউন্ডেশন আয়োজিত একটি রক্তদাতা সম্মাননা অনুষ্ঠানে আমি তার আমন্ত্রণ পাই। দীর্ঘদিন পর আমাদের সাক্ষাৎ হলো। মহাজাতক আমাকে কোয়ান্টামম ল্যাব ঘুরিয়ে দেখালেন। আমি বিস্মিত হলাম। এত মানুষ এখানে রক্ত দিচ্ছে, মানুষের জীবন বাঁচাতে সাহায্য করছে! মনে হলো, তিনি এখন সম্পূর্ণ অন্য মাত্রায় কাজ করছেন। দিনে দিনে তার কাজের ক্ষেত্র বিস্তৃত থেকে বিস্তৃততর হচ্ছে।

কোয়ান্টামমের বিভিন্ন বইপত্র পড়ে দেখলাম—সেই প্রথম জীবনে যে সত্য ও আশাবাদের কথাগুলো তিনি বলতেন, এতে তারই প্রতিফলন। কোয়ান্টামমে এসে তার বাস্তব রূপ দেখতে পেলাম। বিচিত্র ধর্মবর্ণের এত বিদ্যার্থী এখানে একসাথে পড়াশোনা করছে, ওদের সাথে কথা বলে আমার মনটা ভরে গেল।

আমাদের চারপাশে অনেক হিসেবি স্বপ্নদ্রষ্টা আছেন, যারা এ ধরনের কাজগুলো করেন ঢাকার আশেপাশে। যাতে বিদেশিরা আসতে পারে, সেইসাথে কিছু সাহায্যও উড়ে আসে। সাংবাদিকরা যাতে নিয়মিত আসতে পারেন, তাতে প্রচার পেতেও কিছু সুবিধা হয়। এসব কোনো উদ্দেশ্য আমি এখানে দেখতে পাচ্ছি না।

আর উদ্দেশ্যটা নেই বলেই কোয়ান্টামম এটা করেছে ঢাকা থেকে এত দূরে, পার্বত্য এলাকায়। এমনতেও আমাদের সমতলের বিশাল বাংলার তুলনায় এই পার্বত্য এলাকা কিছুটা অবহেলিত। সবমিলিয়ে বলতে পারি, একটি অসাধারণ কাজ এখানে হচ্ছে। স্বপ্নে, কর্মে, উদ্যমে কোয়ান্টামম ক্রমাগত আরো বিকশিত হোক, এটাই আমার আন্তরিক প্রত্যাশা।

[অনুলিখিত]

সদ্যপ্রয়াত কবি ও লেখক সৈয়দ শামসুল হক নভেম্বর ২০১৫-তে সত্রীক বান্দরবান লামার কোয়ান্টামম সফর করেন। চার দিনব্যাপী এ সফরকালে প্রদত্ত এক সাক্ষাৎকারে কোয়ান্টামম নিয়ে তার অনুভূতি ও আশাবাদের পাশাপাশি কবি গুনিয়েছেন তার কিছু একান্ত ভাবনা ও উপলব্ধির কথা। সে-সব কথামালার নির্বাচিত অংশ নিয়ে এই প্রতিবেদন।

রক্তদাতা সম্মাননা অনুষ্ঠানে সৈয়দ শামসুল হক রক্তদাতারা প্রতিনিয়ত পুণ্য অর্জন করছেন



“এ সম্মাননা অনুষ্ঠানের শুরু থেকে প্রতিটি বিষয়ে এখানকার সময়ানুবর্তিতা আমাকে মুগ্ধ করেছে। কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন পরিচালিত এ স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, প্রয়োজনীয় ও মহান একটি উদ্যোগ।

একটি আদর্শ জীবন গড়ার মূল সূত্রই হচ্ছে আত্মবিশ্বাস। এ বিশ্বাসের সাথে আরো একটি বিষয় জড়িত, সেটি হলো ত্যাগ। মানব সমাজ একটি বন্ধনের সমাজ। আমরা সবাই এখানে একত্রে বসবাস করছি। একে অপরের কাছে অনবরত আমরা গ্রহণ করছি, খণী হচ্ছি। তাই আমাদের দাতা হতে হবে। আর রক্তদান হচ্ছে একটি মহৎ দান।”

[কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন আয়োজিত ৭৩ তম শত আজীবন রক্তদাতা সম্মাননা অনুষ্ঠান, ২২ সেপ্টেম্বর ২০১০]

“শ্বাস গ্রহণ করাটাই বেঁচে থাকা নয়। বেঁচে থাকা পূর্ণতা পায় অন্যের জন্যে ভাবায়, অন্যের কল্যাণে কাজ করায়। পরের জন্যে নিঃস্বার্থভাবে যারা ভাবতে পারেন, তারাই প্রকৃত অর্থে বেঁচে আছেন।

কারণ একজন মানুষকে বাঁচাতে পারলে সমগ্র মানবজাতিকেই যেন বাঁচানো হয়। যারা রক্তদান করছেন, তারা প্রতিনিয়ত এরকম পুণ্য অর্জন করছেন। আমরা যদি চেতনা দিয়ে অনুভব করতে পারি—আমার জীবন আমার কাছে যেমন মূল্যবান তেমনি অন্যের জীবনও, তাহলে স্বেচ্ছায় রক্তদানের কাজটি আমাদের এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।”

[কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন আয়োজিত ১০ম সিলভার ও ৮ম গোল্ডেন ব্লাড ডোনার সম্মাননা অনুষ্ঠান, ১১ জানুয়ারি ২০১৩]



কোয়ান্টাম স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রম মুমূর্ষের সেবায় দিন-রাত ২৪ ঘণ্টা

দেড় দশকের বেশি সময় ধরে নিরাপদ রক্তের চাহিদা পূরণে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে কোয়ান্টাম স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রম। সর্বাধুনিক যন্ত্রপাতিসমৃদ্ধ আন্তর্জাতিক মানের কোয়ান্টাম ল্যাব বর্তমানে সরবরাহ করছে রক্তের আটটি উপাদান।

প্রতিদিন গড়ে ২৬০ ইউনিট রক্ত ও রক্ত উপাদান সরবরাহ করা হয়। মুমূর্ষের প্রাণ বাঁচাতে এখানে সারাবছর দিন-রাত ২৪ ঘণ্টা যে-কেউ এ সেবা নিতে পারেন।

এ পর্যন্ত কোয়ান্টাম স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রমের আয়োজনে অনুষ্ঠিত হয়েছে ২,৭৬৮টি ব্লাডক্যাম্প। কোয়ান্টাম ল্যাব ও ক্যাম্প মিলিয়ে রক্ত সংগৃহীত হয়েছে মোট ৫,৪৬,২২৬ ইউনিট।

নিয়মিত রক্তের চাহিদা পূরণের পাশাপাশি

দেশের যে-কোনো দুর্যোগে বা জরুরি প্রয়োজনে মানুষের সেবায় কাজ করছে কোয়ান্টাম স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রম।

অগ্নিদগ্ধদের পাশে কোয়ান্টাম ল্যাব

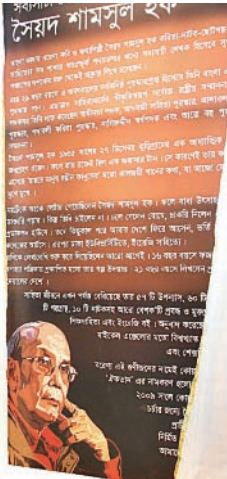
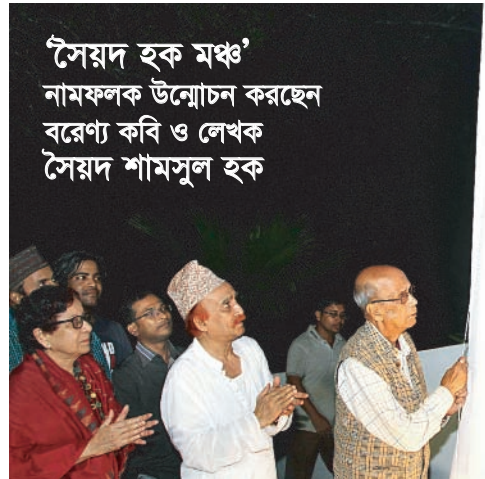
শতকরা ২৫-৩০ ভাগ অগ্নিদগ্ধ রোগীর ক্ষেত্রে রক্তক্ষরণ হয় শরীরের ভেতরে। তাই বার্ন ইউনিটে অগ্নিদগ্ধ রোগীদের জরুরি ও দীর্ঘমেয়াদি চিকিৎসার্থে প্রয়োজন হয় ফ্রেশ ফ্রোজেন প্লাজমা (এফএফপি)।

২০১৪ সালে ২০,৮৮৪ ইউনিট, ২০১৫ সালে ২৩,৪০৪ ইউনিট এবং ২০১৬ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ১৭,৫৪৬ ইউনিট এফএফপি সরবরাহ করেছে কোয়ান্টাম ল্যাব।

মানুষের আস্থায়, জরুরি প্রয়োজনে

২০১৫ সালে রক্ত ও রক্ত উপাদান সরবরাহের মধ্যে ১,০৮৯ ইউনিট সামর্থ্যহীনদের জন্যে বিনা প্রসেসিং খরচে এবং ৫,১৪১ ইউনিট সীমিত সামর্থ্যবানদের জন্যে ন্যূনতম প্রসেসিং খরচে সরবরাহ করেছে কোয়ান্টাম ল্যাব।

- এ পর্যন্ত মোট সরবরাহ করা হয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা নির্ধারিত মানের ৮,১৮,০০৭ ইউনিট বিশুদ্ধ রক্ত ও রক্ত উপাদান।
- ২০০০ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে নিরলস প্রচেষ্টায় কোয়ান্টাম গড়ে তুলেছে ২,৮১,২০৭ জন স্বেচ্ছা রক্তদাতার ডোনার পুল।
- ন্যূনতম তিন বার রক্ত দিয়েছেন (লাইফ লং ডোনার) ৪১,৯৯৮ জন।
- ১০ বার রক্ত দিয়েছেন (সিলভার ক্লাব ডোনার) ৭,৬৩০ জন।
- ২৫ বার রক্ত দিয়েছেন (গোল্ডেন ক্লাব ডোনার) ৭৩০ জন।



বর্ণাঢ্য আয়োজনে সৈয়দ হক মঞ্চের উদ্বোধন

পাহাড়ের কোল ঘেঁষে সুপরিসর সমতল ভূমি। এ উন্মুক্ত চত্বরের তিন দিক ঘিরে আছে লাল ইটে তৈরি দৃষ্টিনন্দন গ্যালারি। ওখানে অনবদ্য শৃঙ্খলায় বসে আছে আট শ ক্ষুদ্রে শিকশিকোরসহ হাজারেরও বেশি দর্শক। চত্বরের সামনের দিকটাতে একটি সুবিশাল মঞ্চ। প্রাচীন ব্যাবিলনীয় স্থাপত্যের আদলে নির্মিত ৪,২৫০ বর্গফুটের এই অ্যাক্সি-থিয়েটারটি আমাদের দেশের বিশালাকার মুক্তমঞ্চগুলোর একটি। প্রথম দেখায় মনে হয়, এর দু-প্রান্ত যেন কোনো অতিকায় পাখির ডানা। মঞ্চের ব্যাকগ্রাউন্ডটা সাজিয়ে দিয়েছে প্রকৃতিই, ওখানে অবিচল দাঁড়িয়ে আছে ধ্যানমগ্ন ঘন বাঁশঝাড়।

একটু আগেই সন্ধ্যা নেমেছে। চারদিক অন্ধকার। হেমন্তের পরিষ্কার আকাশজুড়ে উঁকিঝুকি দিতে শুরু করেছে তারাদের দল। এর মধ্যেই অতিথিরা এসে বসলেন মঞ্চের সামনের কয়েক সারি চেয়ারে। আলো যা এক-আধটু ছিল তা-ও নিভে গেল একে একে। থেমে গেল শিশুদের কিচিরমিচির! দর্শকবৃন্দও চুপ। হালকা সুরে বেজে উঠল শাস্ত্রীয় সুরের ঝংকার। সবমিলিয়ে দারুণ এক রহস্যময় পরিবেশই বাটে। কিছু কি হতে যাচ্ছে আজ এখানে? চমকে দেয়ার মতো কোনো ঘটনা?

একটু পরেই জলদগন্তীর কণ্ঠে কথা বলে উঠলেন নেপথ্য উপস্থাপক। ‘গত চারটি দিন কোয়ান্টামম-এর সবার জন্যে ছিল অত্যন্ত আনন্দময়। আমরা সান্নিধ্য লাভের বিরল সুযোগ পেয়েছি আমাদের দেশের

সাহিত্যঙ্গনের এক প্রোজ্জ্বল নক্ষত্রের—পঞ্চাশের দশকের শুরু থেকেই যিনি তার অক্লান্ত লেখনীর মধ্য দিয়ে স্বাক্ষর করেছেন বাংলা সাহিত্যকে। সেইসাথে জাতির নৈতিকতা, বিবেক ও মুক্তবুদ্ধির জাগরণে রেখেছেন বলিষ্ঠ অবদান। যার একাধিক কালজয়ী সৃজন রুমাল নেড়ে যায় আমাদের পরানের গহীন ভেতর। তিনি বাংলা ভাষার বরণ্য কবি ও সবাসাচী লেখক সৈয়দ শামসুল হক।’

হাজারে দশকের মুহূর্তছ করতালির শব্দ মিলিয়ে না যেতেই তুলে ধরা হলো তার সংক্ষিপ্ত জীবনী ও সাহিত্যকর্মের নাতিদীর্ঘ বিবরণ। তারপর উচ্চকণ্ঠে ঘোষিত হলো—‘সুধী দর্শক, আমরা আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, এই গুণীর কোয়ান্টামম সফর উপলক্ষে এ মুক্তমঞ্চটির নামকরণ করা হলো *সৈয়দ হক মঞ্চ*। আমরা অত্যন্ত আনন্দিত যে, এর মধ্য দিয়ে আজ থেকে কোয়ান্টামম-এর সাংস্কৃতিক কার্যক্রমে শুরু হতে যাচ্ছে এক নতুন অভিযাত্রা।’

এরপর সহধর্মিণী স্বনামখ্যাত লেখিকা ও প্রথিতযশা মনোচিকিৎসক আনোয়ারা সৈয়দ হককে নিয়ে মঞ্চের নামফলক উন্মোচন করলেন সৈয়দ শামসুল হক। এ সময় লেখক-দম্পতির সাথে ছিলেন গুরুজী শহীদ আল বোখারী মহাজাতক ও কোয়ান্টামমের অন্যান্য দায়িত্বশীলবৃন্দ।

ফলক উন্মোচনপর্ব শেষ হতেই দেখা গেল আসল চমক। ধীরে ধীরে সরে যেতে থাকে মঞ্চের ব্যাকগ্রাউন্ডে থাকা কালো পর্দাটি। চারপাশ থেকে জ্বলে ওঠে ঝলমলে রঙিন সব আলো। বর্ণাঢ্য সে আলোয় পর্দার আড়াল থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে সৈয়দ হক-এর একটি বিশালাকার প্রতিকৃতি। ডিজিটাল পেইন্টিংয়ে প্রস্থে ৯ ফুট ও দৈর্ঘ্যে ১২ ফুটের এক নান্দনিক পোর্ট্রেট। কবি দেখলেন, আবেগে সিঁদ্ধ হলেন। চোখ মুছলেন। কবির

কোয়ান্টামমে সৈয়দ হক মঞ্চ ‘আমার প্রাণ এখানেই রয়ে গেল’—সৈয়দ শামসুল হক



কোয়ান্টাম কসমো স্কুল এন্ড কলেজের শিক্ষার্থী ক্ষুদ্রে কোয়ান্টা শিল্পীদের সাথে সৈয়দ হক দম্পতি, ৫ নভেম্বর ২০১৫

আবেগ নিমেষেই ছুঁয়ে গেল উপস্থিত দর্শকদের। গোটা চত্বর তখন মুখরিত ওদের অভিবাদন আর হর্ষধ্বনির কল্লোলে।

৫ নভেম্বর ২০১৫। সেদিন সন্ধ্যায় এভাবেই বান্দরবান লামার কোয়ান্টামমে এক আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে যাত্রা শুরু হয় ‘সৈয়দ হক মঞ্চের’। কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানটিতে তারপর একে একে অনুভূতি ব্যক্ত করেন বিশেষ অতিথি আনোয়ারা সৈয়দ হক, প্রধান অতিথি সৈয়দ শামসুল হক এবং সভাপতি শহীদ আল বোখারী মহাজাতক।

কবির অনুভূতি ছুঁয়ে গেল সবাইকে

এরপর কবি শোনালেন তার অনুভূতি। ‘যে মানুষের জন্যে আমি সারাজীবন ভেবেছি, যাদের এতটুকু মঙ্গলের জন্যে ৬৪ বছর ধরে লিখছি, সেই মানুষের সামনেই যেন ৬৪টি ধাপ পেরিয়ে আমাকে একটি শীর্ষ অবস্থানে পৌঁছে দিল আজকের এই ঘটনা।

একটু আগে যখন মঞ্চের নাম ঘোষণা করা হলো তখন আমি কেঁদে উঠেছিলাম। আমার চোখ দিয়ে দরদর করে পানি পড়ছিল। আমার মনে হলো, এ তো পুরস্কার নয়। মানুষ আমাকে স্পর্শ করল। জীবন আমাকে স্পর্শ করল। সত্য আমাকে স্পর্শ করল। বাণী আমাকে স্পর্শ করল। বলল, হাঁ, তুমি যা করেছ সত্যের জন্যে করেছ। দেশের জন্যে করেছ। এবং এই দেশ, এই মাটি, এই আকাশ, এই খোলা প্রকৃতি তোমাকে আজ পুরস্কৃত করছে।

কাল এখনকার ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা এলো আমার সাথে কথা বলবার জন্যে। আমার নিজেরই লেখা কবিতা শোনাল ওরা আমাকে। আমি যেখানে বসে এই কবিতা লিখেছি সেই ঢাকা শহর থেকে কত দূরে এই পাহাড়ের কোলে বসে নৃ-জাতিগোষ্ঠীর একটি শিশুকন্যা আমাকে শোনাচ্ছে—সূর্য ওঠার

পূর্বদেশ বাংলাদেশ বাংলাদেশ ...।

এর চেয়ে বড় পুরস্কার আর কী হতে পারে একজন লেখকের জন্যে? আগামী দিনে যারা নেতৃত্ব দেবে তাদের কণ্ঠে আমি একটি-দুটি কথা তুলে দিতে পেরেছি। যা তার দেশকে চেনায়, ভাষাকে চেনায়, জাতিকে চেনায়। আজকের এই সম্মান আমার সে কাজেরই স্বীকৃতি। কিছুক্ষণ আগে যখন সন্ধ্যা হচ্ছিল তখন কোয়ান্টামমের রাহমাতান বাংলাতে বসে আমি দূরে আকাশের দিকে তাকিয়ে ছিলাম। রবীন্দ্রনাথের একটা কবিতা মনে পড়ছিল—

যদিও সন্ধ্যা আসিছে মন্দ মন্ত্রের,

সব সংগীত গেছে ইঙ্গিতে থামিয়া,

যদিও সঙ্গী নাহি অনন্ত অন্দের,

যদিও ক্লান্তি আসিছে অঙ্গে নামিয়া,

মহা আশঙ্কা জপিছে মৌন মন্তরে,—

দিক্-দিগন্ত অবগুণ্ঠনে ঢাকা—

তবু বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর,

এখনি, অন্ধ, বন্ধ করো না পাখা।

এ সম্মান দেয়ার মধ্য দিয়ে যেন আমাকে বলা

হচ্ছে—এখনি অন্ধ, বন্ধ করো না পাখা ...।

এর মানে হলো, যেতে হবে, যেতে হবে উভজীন হয়ে। মাটিতে পড়ে থাকলে চলবে না। আমাদের এই ভুখণ্ডেরই এক মহান কবি ইকবাল তার গজলে বলেছেন, *সিতারো সে আগে হয়, জাঁহা আউর ভি ...।* এর বাংলা আমি একসময় করেছিলাম—*তারামণ্ডল পেরিয়ে জগৎ অনেক রয়েছে আরো ...।*

আমার বলতে ইচ্ছে করছে, আমি স্বর্গের কথা শুনেছি, চোখে দেখি নি। এই কোয়ান্টামমে এসে আমি সেই স্বর্গ দেখেছি। এর জয় হোক, কল্যাণ হোক, মঙ্গল হোক।

কেন একে স্বর্গ বলছি? এখানে অনেক গাছপালা আছে, কোনো কোলাহল নেই, দূষণ নেই—তার জন্যে কি? না, এ-তো একটা পটভূমি মাত্র। আসল

ব্যাপারটি হলো, সকল ধর্মবর্ণের সন্তানেরা এখানে মিলেমিশে রয়েছে। বাংলাদেশে আর একটি জায়গার কথা আমি বলতে পারব না যেখানে বাঙালি, পাহাড়ি, আদিবাসী ও ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীসহ ২০টি জাতিসত্তার মানুষ এভাবে একসাথে থাকছে। এ এক বিরল উদাহরণ! আসলে এই হচ্ছে বাংলাদেশ।

লালন ফকিরের একটি কথা আমি খুব মানি—*এমন মানব জনম আর কি হবে//মন যা কর তুরায় কর এই হবে।* এই মানবজন্ম আর হবে না। আজ এখানে দাঁড়িয়ে বলতে পারি, এই ‘করা’-র অনেকটাই আমি এখানে দেখতে পাচ্ছি। আমি সত্যিই অভিভূত যে, আমার স্ত্রী ও আমি এরকম একটি মহামুহূর্তে এখানে উপস্থিত থাকতে পেরেছি।

আমি স্মরণ করছি আমার গর্ভধারিণী মা-কে, যিনি অত্যন্ত সংগ্রামমুখর জীবন কাটিয়ে গেছেন আমাদের আট ভাইবোনকে মানুষ করতে। আর আমার বাবা বলতেন, সবসময় নিজেকে জিজ্ঞেস করবে—‘আমি এখানে কী করছি?’ অর্থাৎ আমি কেন? এমন নয় যে, এই জীবনপ্রবাহের ভেতর দিয়ে আমি ভেসে চলেছি। আমাকে প্রতিমুহূর্তে জানতে হবে,

জিজ্ঞেস করতে হবে নিজের কাছেই যে, ‘আমি কে? আমি কী করছি?’ আমার বাবা এটা নিজে করেছেন। বাবা কলকাতায় ডাক্তারি করতেন, একপর্যায়ে সেটা ছেড়ে এ-দেশের প্রত্যন্ত একটা গ্রামে এসে সারাজীবন কাটিয়েছেন। মানুষকে চিকিৎসাসেবা দিয়েছেন। আজ এই দূরবর্তী পাহাড়প্রান্তে আমার বাবার কথা মনে পড়ছে। আমার সেই পিতার মতো মহাজাতকও একটি দূরবর্তী জায়গায় এসেছেন, কেবল মানুষের জন্যে। তার যতটুকু সাধ্য আছে তা দিয়ে মানুষের জন্যে কিছু করার লক্ষ্যে।

এই মঞ্চে বহু অনুষ্ঠান হবে। এই মঞ্চ এই খোলা আকাশের নিচে ঘুমিয়ে থাকবে না। এখানে প্রাণ জেগে উঠবে। এখানে সত্যের উচ্চারণ হবে। এখানে মানুষের কলকণ্ঠে জীবনের বন্দনা আমরা শুনতে পাব। আমি তার দিকে কান পেতে থাকলাম। আমি যেখানেই থাকি আমার প্রাণ এখানেই রয়ে গেল। আপনাদের



ভিডিও দেখুন :
video.qm.org.bd

সবাইকে অভিবাদন জানাই। জয় হোক মানুষের। কল্যাণ হোক। ঈশ্বর আরো কাজ করবার শক্তি কোয়ান্টামকে দিন।’

আবেগমথিত ভাষায় কবির অনুভূতি আলোড়িত করে উপস্থিত সবাইকে।

মানুষের হৃদয়েই বীরের স্থান

অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে গুরুজী শহীদ আল বোখারী মহাজাতক বলেন, ‘কবি ও কথাশিল্পী সৈয়দ হক আমাদের জাতীয় ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনের একজন বরণ্য বীর। ক্ষুদ্র পরিসরে হলেও তার প্রতি আজ আমরা আমাদের শ্রদ্ধা নিবেদন করতে পেরেছি।

আসলে বীরের কোনো মৃত্যু নেই। বীরের কোনো সম্মানের প্রয়োজন হয় না। মানুষের হৃদয়েই হয় তার বিশিষ্ট ও সম্মানীয় স্থান। তারপরও মানুষ ভালবাসা ও শ্রদ্ধা থেকে তাদের সম্মান জানায়। আর যে মানুষেরা একজন বীরকে তার জীবদ্দশায় সম্মান জানায়, তারা আসলে নিজেদেরই সম্মানিত করে। তার বিশ্বাস ও কর্ম থেকে নিজেরা অনুপ্রাণিত হয়।

তাই আজকের এ সম্মানটুকু জানানোর সুযোগ পাওয়ার জন্যে আমরা পরম করণাময়ের কাছে গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আসলে যে জাতি তার বীরদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারে না, তারা স্রষ্টার প্রতিও কৃতজ্ঞ থাকতে পারে না।

আজ এই ক্ষণে আমরা শুধু এটাই প্রার্থনা করি, সৈয়দ হক দম্পতির কাজের মধ্য দিয়ে যেন প্রজন্মের পর প্রজন্ম আলোকিত ও সমৃদ্ধ হতে থাকে।’



সৈয়দ হক মঞ্চের সামনে লেখক-দম্পতি

সৃষ্টির আনন্দে দীপ্যমান জীবন



২৭ ডিসেম্বর ১৯৩৫। কুড়িগ্রামের একটি আধ্যাত্মিক পরিবারে জন্ম নেন বাংলা ভাষার বরেণ্য সাহিত্যিক সৈয়দ শামসুল হক। একটি মহান জীবন গঠনের লক্ষ্যে তার মনে শৈশবেই গেঁথে দেন তার বাবা হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক সৈয়দ সিদ্দিক হুসাইন। পুত্রকে তিনি আত্মস্থ করান—

প্রথম যেদিন তুমি এসেছিলে ভবে
কৈদেছিলে একা তুমি, হেসেছিল সব
এমন জীবন তুমি করিবে গঠন
মরণে হাসিবে তুমি, কাঁদিবে ভুবন।

সৈয়দ হকের বাবা বিশ্বাস করতেন, বড় হতে হলে বড় জায়গায় যেতে হবে। সম্ভবত সে কারণেই তিনি মাত্র ১২ বছর বয়সের কিশোর পুত্রকে ঢাকা পাঠিয়ে দেন। উদ্দেশ্য—ভালো স্কুলে পড়াশোনা।

মনছবি যার লেখক হওয়ার

সৈয়দ শামসুল হক ভর্তি হলেন ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে। ১৯৫০ সালে তিনি বিজ্ঞান বিভাগ থেকে মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তারপর সেকালের খ্যাতনামা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান জগন্নাথ কলেজে ভর্তি হলেন। ততদিনে তার মনে দানা বাঁধতে শুরু করেছে লেখক হওয়ার মনছবি। তার বাবা এতে মোটেই রাজি নন। তার স্বপ্ন—পুত্র ডাক্তার হবে। কিন্তু পুত্রের করোটিতে তো নিত্যদিন শব্দের খেলা!

অগত্যা তিনি বোম্বে পালিয়ে গেলেন। ফিরে এলেন ১৯৫২ সালে। মহান ভাষা আন্দোলনে তখন উত্তাল হয়ে উঠেছে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান। পরের বছর বের হলো হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত অবিস্মরণীয় সংকলন *একুশে ফেব্রুয়ারী*। তাতেই প্রথমবারের মতো প্রকাশিত হয় সৈয়দ হকের কবিতা। ততদিনে লেখক হওয়ার ব্যাপারে তার সংকল্পের দৃঢ়তা দেখে তার বাবাও সম্মতি দিয়েছেন।

১৯৫৪ সালে উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করলেন সৈয়দ হক। সে-বছরই প্রকাশিত হলো তার প্রথম গল্পগ্রন্থ *তাস*। উৎসর্গ করলেন তার সদ্যপ্রয়াত পিতাকে। এই বইয়ে অন্তর্ভুক্ত গল্পগুলোর মাধ্যমে তিনিই প্রথম চিত্রিত করেন পূর্ব বাংলার বিকাশমান মধ্যবিত্ত শ্রেণির সুখ-দুঃখের টানাপোড়েন।

পৃথিবী সাহসী মানুষের জন্যে

অতঃপর সৈয়দ শামসুল হক ভর্তি হলেন ঢাকা

বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগে। কিন্তু স্নাতক পাশের আগেই প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাজীবনের সমাপ্তি টানলেন এই উদীয়মান লেখক। লেখালেখি করেই জীবিকা নির্বাহের সাহসী সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি। পৃথিবীর পাঠশালায় শুরু হলো তার যাত্রা।

১৯৫৭ সালে তার লেখালেখির জগতেও ঘটে বাঁকবদল। চলচ্চিত্র তাকে হাতছানি দেয়। খানিকটা আর্থিক প্রয়োজনে, খানিকটা শৈশবস্মৃতির হাতছানিতে। সেই ছোট্ট বয়সে মা সৈয়দা হালিমা খাতুনের হাত ধরে কুড়িগ্রাম টকিজে সিনেমা দেখতে যাওয়ার স্মৃতি যেন তীব্র ঘণ্টা বাজায় তার করোটির গভীরে। চিত্রনাট্য রচনায় সম্পৃক্ত হন তিনি।

পরবর্তী তিন দশকে প্রায় ৪০টি চলচ্চিত্রের চিত্রনাট্য ও সংলাপ তিনি রচনা করেন। *বড় ভাল লোক ছিল* ও *পুরস্কার* এ দুটি চলচ্চিত্রের চিত্রনাট্যকার হিসেবে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার অর্জন করেন। এছাড়াও সুভাষ দত্ত পরিচালিত *সুতরাং* তার রচিত উল্লেখযোগ্য চিত্রনাট্য।

গীতিকার হিসেবেও তার সাফল্য অসামান্য। *হায় রে মানুষ রঙিন ফানুস, এমন মজা হয় না, এই যে আকাশ এই যে বাতাস, তোরা দেখ দেখরে চাহিয়া, তুমি আসবে বলে কাছে ডাকবে বলে, যার ছায়া পড়েছে মনেরই আয়নাতে*—এমন হৃদয়স্পর্শী গানগুলো আজও মানুষের মুখে মুখে ফেরে। এছাড়াও এই আমাদের বাংলাদেশ এবং ইতিহাসের মহানায়ক-সহ বেশ কিছু তথ্যচিত্র তিনি নির্মাণ করেন।

১৯৬৬ সালে মাত্র ২৯ বছর বয়সে সৈয়দ হক ছোটগল্পের জন্যে বাংলা একাডেমী পুরস্কার লাভ করেন। আর কবি হিসেবে তাকে খ্যাতিমান করে তোলে ১৯৭০ সালে প্রকাশিত *বৈশাখে* রচিত *পংক্তিমালা* কাব্যগ্রন্থটি। আশির দশকে তার রচিত সনেট *পরানের গহীন ভিতর* বাংলা সাহিত্যের আরেকটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন।

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বর্বরতার প্রতিবাদে শামসুল হক রচনা করেন *পহেলা মার্চ ১৯৭১* কবিতাটি। যা প্রকাশিত হয় *দৈনিক পাকিস্তান*-এর সম্পাদকীয় পাতায়। মুক্তিযুদ্ধের শেষদিকে তিনি খবর পাঠক হিসেবে যোগ দেন লন্ডনে *বিবিসি* বাংলা-য়। ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের খবরটি তিনিই পাঠ করেছিলেন। কবি যাকে অভিহিত

করেছেন তার বেতার জীবনের শ্রেষ্ঠ মুহূর্ত হিসেবে।

১৯৭৮ সাল পর্যন্ত বিবিসি-তে প্রযোজকের দায়িত্ব পালনকালে তিনি বিশ্বসাহিত্য থেকে কয়েকটি নাটক প্রযোজনা করেন। এই অভিজ্ঞতাই তাকে উদ্বুদ্ধ করে নাট্যরচনায়। সমৃদ্ধ হয় বাংলা কাব্যনাট্যের ভাণ্ডার। সৈয়দ হকের সোনাঝরা কলমে রচিত হয় অনবদ্য সব নাটক।

তার প্রথম নাটক মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিকায় রচিত *পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়*। বাংলাদেশের নাট্যজগতে প্রথম সুবর্ণ জয়ন্তী অভিনয় সম্পন্ন হয় এই নাটকটির। এর ভূমিকায় তিনি লেখেন—‘সত্তরের দশকের মাঝামাঝি ... রচনা করি *পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়*। এক সংকীর্ণ ঘরে, টেবিলের অভাবে দেয়ালে পা ঠেকিয়ে হাঁটুর ওপর খাতা রেখে, অফিস যাতায়াতের পথে পাতালরেলে মনে মনে।’

তার আরেকটি বিখ্যাত কাব্যনাটক *নূরলদীনের সারাজীবন*। ব্রিটিশবিরোধী লড়াইয়ের প্রেক্ষাপটে রচিত নাটকে আমরা আবিষ্কার করি মুক্তিযুদ্ধ কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। বরং স্বাধিকারের দাবিতে বাঙালির শত শত বছরের গণআন্দোলনের সফল পরিণতি। তার উপন্যাসেও ঘুরেফিরে বার বার এসেছে আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের প্রসঙ্গ। *নিষিদ্ধ লোভান*, *নীল দংশন*, *বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ*—সৈয়দ হক রচিত এই উপন্যাসগুলো মুক্তিযুদ্ধকালে মানুষের দুঃসহ যাতনা, অসহায়ত্ব ও প্রতিরোধের কিছু অনন্য দলিল। একইসাথে তা লেখকের দেশপ্রেমের অনুপম স্বাক্ষর।

আর মাতৃভাষা বাংলার প্রতি তার অনুরাগ অনুভবের কিছুটা আগামী প্রজন্মের হৃদয়ে সঞ্চারিত করার উদ্দেশ্যে লিখেছেন অসামান্য দুটি গ্রন্থ *কথা সামান্যই* ও *মার্জিনে মন্তব্য*। তরুণ লেখকদের প্রতি পরামর্শ দিয়েছেন—‘পড়ার কোনো বিকল্প নেই। বই পড়া হচ্ছে বৃক্ষের মতো একটু একটু করে আকাশের কাছে যাওয়া।’

লক্ষ্যে অবিচল ॥ আমৃত্যু কর্মচঞ্চল

শত প্রতিকূলতার মুখেও লক্ষ্যে অবিচল থাকার অনন্য উদাহরণ সাহিত্যস্রষ্টা সৈয়দ শামসুল হক। মেধার সাথে কঠোর পরিশ্রম ও নিরবচ্ছিন্ন সাধনার সংযোগ ঘটিয়ে জীবদ্দশাতেই তিনি হয়ে ওঠেন বাংলা ভাষার অন্যতম প্রধান লেখক। প্রতিদিন সকালে ঠিক ঘড়ি ধরে লেখার টেবিলে বসা বা পড়ার জন্যে লেখালেখির সমান সময় বরাদ্দ রাখা তার সময়নিষ্ঠার কথাই জানান দেয়।

আপন কাজের প্রতি কতটা নিবেদিত ছিলেন তা আমাদের কাছে স্পষ্ট হয় তার শেষ দিনগুলির বর্ণনা থেকে। ক্যাসারে আক্রান্ত কবি মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েও লিখেছেন ১৭০টি কবিতা, ৮টি গান ও ছোটগল্প। অনুবাদ করেন শেক্সপিয়রের *হ্যামলেট*। নিজের হাতে যখন পারেন নি, অনুলিখন করেছেন তার সহধর্মিণী প্রথিতযশা মনোবিদ ও সাহিত্যিক আনোয়ারা সৈয়দ হক। এভাবেই পূরণ হয় তার আরেকটি মনছবি। তিনি বিশ্বাস করতেন—‘লেখক হওয়া মানেই হলো কাঁধে লাঙল (কলম) নিয়ে জন্মগ্রহণ করা। আমি মৃত্যুর সময়ও যেন কাঁধে লাঙল নিয়ে মরতে পারি।’

সৈয়দ হক তার সাহিত্যকর্মের মধ্য দিয়ে অনুপ্রাণিত করবেন প্রজন্মের পর প্রজন্ম। দূশ বছরের ঔপনিবেশিক শোষণে সৃষ্ট মনোজাগতিক দাসত্ব থেকে মুক্ত হয়ে আমরা এগিয়ে চলেছি মুক্ত বিশ্বাসের পথে, মহান জাতি হিসেবে গড়ে ওঠার লক্ষ্যে। এই কল্যাণমুহূর্তে সবার হৃদয়ে অনুরণিত হোক মহান এই লেখকের সেই কালজয়ী আহ্বান—*জাগো বাহে কোন্ঠে সবাই*।

অগণিত মানুষের মানস সংগঠনে কাজ করছে কোয়ান্টাম —সৈয়দ শামসুল হক



আপনাদের সবার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। আমি অভিবাদন জানাই গুরুজীকে—যিনি শহীদ আল বোখারী মহাজাতক—আমার অনেক দিনের বন্ধু। তিনি অগণিত মানুষের মানস সংগঠনে যে মহাশক্তিরূপে আবির্ভূত হয়েছেন, এই জন্যে আমি কৃতজ্ঞতা জানাই।

শৈশবে গুরুজনদের কাছে শুনেছি, কদরের রাতে গাছপালা বাড়িঘরসহ সমস্ত সৃষ্টি নাকি এক পলকের জন্যে সেজদায় অবনত হয়। সৌভাগ্যক্রমে আমার জন্মও ২৭ রমজানে, তাই একটু স্বাধীনতাও পেতাম জন্মদিনে, আর রাতের পর রাত অপেক্ষা করতাম সেই সেজদা দেখার জন্যে। সেই সৌভাগ্য হয় নি।

কোয়ান্টাম মেথড কোর্সের চার দিন পর অংশগ্রহণকারীদের মুখে যেসব অর্জনের কথা আজ শুনলাম, তাতে মনে হলো, যে বিস্ময়ের জন্যে আমি শিশুকাল থেকে অপেক্ষা করেছি কিন্তু দেখি নি—তার চেয়ে বড় না হোক, অন্তত কাছাকাছি বিস্ময় আমি এখানে দেখেছি!

আপনারা আপনাদের মনের শক্তিকে সবদিক থেকে বাড়িয়ে, জীবনের যতগুলো অভাব রয়েছে ব্যর্থতা রয়েছে সেগুলো থেকে উত্তরণের যে ইতিহাস বা ঘটনাগুলো বললেন, আমি হতবাক হয়ে গিয়েছি।

সক্রেটিস বলেছেন, নিজেকে জানো। অর্থাৎ মনের শক্তিকে অনুভব করো। আমাদের ভক্তজনের গানে আছে—মন তুমি কৃষিকাজ জানো না, যদি জানতে ফলত সোনা। লালন তার গানে বলেছেন—বেদ বিধির পর শাস্ত্র কানা, আর এক কানা মন আমার, এসব দেখি কানার হাটবাজার। তার মানে আমরা কেউ মনের শক্তিকে অনুভব করতে পারি না।

এই মনের শক্তিকে অনুভব করেছে আমার ব্যক্তিগত জীবনে। আমার ১৮ বছর বয়সে আমার

বাবা ইন্তেকাল করলেন, তিনি গ্রামের ডাক্তার ছিলেন। আমার সাত সাতটি ভাই-বোন রেখে তিনি চলে গেলেন সকাল নয়টায়। বিকাল চারটায় দাফন করে বাড়িতে এসে সারাদিনের প্রথম এক গ্লাস চা হাতে নিয়েছি। হঠাৎ তাকিয়ে দেখি আমার ছোট সাতটি ভাইবোন পাখির মতো বসে আছে। আমার মা মূর্ছিত হয়ে পড়ে আছেন। এদের সবার দায়িত্ব এখন আমার! কিন্তু একইসাথে আমার মন বলল, আমি পারব না। এক মুহূর্তের জন্যে আমার মনে হয় নি, আমি পারব না। ১৯৫৪ সালের ঘটনা বলছি।



ভিডিও দেখুন :

video.qm.org.bd

আজকে এত বছর পরে আপনারা যা দেখছেন আমাকে বা আমার সাতটা ভাইবোনকে, তারা কেউ সমাজের ক্ষতিকর মানুষ নয়। প্রত্যেকেই শিক্ষিত ভদ্র ও বৈধ উপার্জন করছেন। প্রত্যেকের নিজের বাড়ি রয়েছে ঢাকা শহরে। আমি পেরেছি।

আমার বাবা চেয়েছিলেন আমি ডাক্তার হই। আমি বলেছিলাম আমি লেখক হবো। বাবা আমাকে বহু রকম চাপ দিয়েছেন। একপর্যায়ে তিনি মেনে

নেন এবং বলেন, তুমি লেখ, তবে একটা শর্ত, তুমি মানুষের কথা লিখবে, আর লিখবে সবচেয়ে ভালো কলমে, সবচেয়ে ভালো কাগজে। অর্থাৎ তিনি আমার ভেতর একটা আত্মমর্যাদা দেয়ার চেষ্টা করেছেন।

বাবা আমার কোলে মাথা রেখে ১৯৫৪ সালে মারা গেলেন। বললেন, ‘বাবা, তোমার ওপর অনেক দায়িত্ব রেখে গেলাম, মাথা ঠান্ডা রাখবে।’ এই আলফা লেভেল।

এই যে বার বার মহাজাতক বলছেন, মনের

শক্তিকে জাগ্রত করতে হবে। মাইন্ড ইজ দ্য মোস্ট পাওয়ারফুল ইনস্ট্রুমেন্ট ইন আওয়ার লাইফ। বিজ্ঞানলেখক আর্থার সি ক্লার্ক বলেছেন, মানুষ যা কল্পনা করতে পারে, সেটাই বাস্তবায়িত করতে পারে। তাই কল্পনা করতে হবে। কল্পনাটা অযৌক্তিক হবে না। যুক্তিভিত্তিক হবে এবং ধীরস্থির মাথায় অগ্রসর হতে হবে। এই জ্ঞানটাই মহাজাতক আমাদের সবাইকে দেয়ার চেষ্টা করেছেন।

আমি এসেছি, আমি দেখেছি। এই কোর্সে কীভাবে আমার আসা, সেটা বলি। মহাজাতকের সাথে আমার একটা মেন্টাল টেলিপ্যাথি হয়েছে। ৪০ বছর আগে তার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়। তখন উনি কালো জামা, কালো পাজামা পরতেন। কালো হচ্ছে সমস্ত রঙের অনুপস্থিতি। তারপর ওঁকে দেখলাম সাদা জামা, সাদা পাজামা পরতে। সাদা হচ্ছে সমস্ত রঙের উপস্থিতি।

তারপর বছর পাঁচেক আগে, এই মানুষটা যার সাথে ৪০ বছর থেকে আমার একটা আত্মিক সম্পর্ক, মনে হলো, তিনি বোধহয় আমাকে ডাকছেন। একটা মানসিক বার্তা পেলাম। মনের এ-ও একটা অসীম ক্ষমতা যে, মানসিক বার্তা পাঠানো যায়। মানসিক বার্তা পাঠানো সম্ভব, পাওয়া সম্ভব। সেই বার্তা আমি কতটা পাঠিয়েছি জানি না, তবে তিনি নিশ্চয়ই পাঠিয়েছেন।

ওঁর প্রতিষ্ঠানের ব্লাড ব্যাংকের সাথে পরিচিত হয়ে আমি মুগ্ধ হয়ে যাই। এত বড় একটি কাজ হচ্ছে! আমি এই রকম এত বড় নজির বাংলাদেশের আর কোথাও দেখি নাই।

ওঁর আমন্ত্রণে আমি লামার কোয়ান্টামমে গিয়েছি। কোয়ান্টামমে গিয়ে আমি হতবাক হয়ে গেছি—জাতিধর্মবর্ণ নির্বিশেষে শিশুদের শিক্ষার জন্যে তিনি যা করছেন, এ এক অতুলনীয় উদাহরণ।

আমার পরিবার হচ্ছে সুফি পীর পরিবার। আমি ত্রয়োদশ পুরুষ—বাবা হযরত শাহ সৈয়দ আলী মাহমুদের। আমার শরীরে আধ্যাত্মিক রক্ত নিশ্চয়ই প্রবাহিত আছে। আমি স্রষ্টায় বিশ্বাস করি, সৃষ্টির শক্তিতে বিশ্বাস করি, সর্বোপরি বিশ্বাস করি সকল ধর্মের সকল মানুষের ভেতর সত্য বিরাজ করে। সেই সত্যকে যেন আমরা অনুভব করতে পারি। সেই সত্যকে অনুভব করার একটি পথ হচ্ছে মনকে বিকশিত করা, মনকে শক্তিশালী করা, মানসকে সংগঠন করা। সেই কাজটি গুরুজী শহীদ আল বোখারী মহাজাতক করে চলেছেন। তার ওপরে আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক।

[কোয়ান্টাম মেথড চলমান ৪০০ ব্যাচে অংশগ্রহণ করেন বাংলা ভাষার বরণ্য কবি ও লেখক সৈয়দ শামসুল হক। কোর্সের সমাপনী দিনে প্রত্যয়ন অনুষ্ঠানে তিনি বলেন তার অনুভূতি ও উপলব্ধির কথা]



জাতীয় প্রেস ক্লাব মিলনায়তনে ইংরেজি মেডিটেশন সিডি প্রকাশনা অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সৈয়দ শামসুল হক, ৫ জুলাই ২০১১

আনোয়ারা সৈয়দ হক ॥ অর্ধ শতাব্দীর সহযোদ্ধা



প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক আনোয়ারা সৈয়দ হক। উপন্যাস, ছোটগল্প, আত্মজৈবনিক রচনা, শিশুতোষ গ্রন্থ-সবমিলিয়ে অত্যন্ত বৈচিত্র্যময় তার সাহিত্যকর্ম। একজন সমাজ-সচেতন লেখকের পাশাপাশি তিনি দেশের একজন প্রতিভাশালী মনোচিকিৎসক। পেশাগত জীবনে জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটের প্রাক্তন অধ্যাপক ডা. আনোয়ারা বর্তমানে ইব্রাহিম মেডিকেল কলেজের (বারডেম) সাইকিয়াট্রির অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত আছেন।

তার আরেকটি পরিচয় পারিবারিক জীবনে তিনি কবি সৈয়দ শামসুল হকের সুযোগ্য সহধর্মিণী। ৫০ বছরের দীর্ঘযাত্রায় যিনি ছিলেন কবির সহযোদ্ধা ও সৃজনসঙ্গী। আত্মজীবনীমূলক বিভিন্ন লেখা ও

সাক্ষাৎকারে সৈয়দ হক একাধিকবার উল্লেখ করেছেন নিজের সৃষ্টিজীবনে এই মানুষটির গুরুত্বপূর্ণ অবদানের কথা।

সৈয়দ শামসুল হকের প্রয়াণের পর প্রকাশিত তার একটি সাক্ষাৎকারেও (৩০ সেপ্টেম্বর, দৈনিক প্রথম আলো) সেই কৃতজ্ঞতাই পুনঃপুনঃ বর্ণিত হয়েছে কবির বয়ানে-‘আমি জীবনের কাছে ঋণী আরো বহু কারণের মতো এই কারণে যে, আনোয়ারা আমার জীবনে এসেছে। রোগে-শোকে, সম্পদে-বিপদে বিগত অর্ধশতক যেভাবে সঙ্গ দিয়ে গেছে আমাকে; আমি বড় কৃতজ্ঞ ও ঋণী কাছে।’

৫ নভেম্বর কোয়ান্টামমের মুক্তমঞ্চের নামকরণ করা হয় সৈয়দ হক মঞ্চ। এ অনুষ্ঠানে আনোয়ারা সৈয়দ হক তার আবেগসিক্ত বক্তৃতায় বলেন, ‘আমি বাকরুদ্ধ! চোখ জলে ভিজে যাচ্ছে বার বার। কত বাড়বাগ্নী চড়াই-উতরাই সংগ্রাম সৈয়দ হকের সাহিত্যিক জীবনে একের পর এক এসেছে, মাঝে মাঝে মনে হতো সমস্ত জীবনটাই বুঝি ব্যর্থ হয়ে গেল। সমস্ত কষ্টই বুঝি জলে গেল। আশাভঙ্গ হতো কখনো কখনো। যদিও হাজারো দুঃখ বিপর্যয় অনটনের পরও তার সাহিত্যিকর্ম যেন ক্রমশ

সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে, সে চেষ্টাই আমার সবসময় ছিল। চেয়েছি, তিনি যেন নিজের মতো করে তার সাহিত্যজগতকে গড়ে তুলতে পারেন। আজ এখানে দাঁড়িয়ে মনে হচ্ছে আমার সেই চেষ্টা বৃথা যায় নি।

সৈয়দ হক যে এত ব্যাপকভাবে নিজেকে ছড়িয়ে দিতে পেরেছেন, বিস্তৃত করতে পেরেছেন, মানুষের মনের ভেতর স্থান করে নিয়েছেন তা এখানে না এলে আমি কখনোই বুঝতে পারতাম না। আজ কেবলই মনে হচ্ছে আমার এতদিনের যাবতীয় ত্যাগ ও পরিশ্রম সার্থক। সমস্ত কষ্ট দুঃখ দহনযন্ত্রণা আমার আজ কানায় কানায় প্রস্ফুটিত হয়ে ফুলের মতো ফুটে উঠেছে। আজ এখানে এমন একটি আয়োজনের মধ্যে থাকতে পেরে আমরা নিজেদের গৌরবান্বিত ও কৃতজ্ঞ মনে করছি।

এভাবে দেশের একটি গহীন ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন আজ এত মানুষের মাঝখানে যে সম্মান আমাদের দিল, তা এ সমাজে বিরল। কোয়ান্টাম আরো বড় হোক, আরো অসংখ্য নিপীড়িত ও বঞ্চিত মানুষের স্থান এখানে হোক। হয়ে উঠুক অসহায়ের সহায়স্থল।’



নভেম্বর ২০১৫-তে (২ থেকে ৬ নভেম্বর) বান্দরবানের কোয়ান্টামম সফর করেন সৈয়দ শামসুল হক ও আনোয়ারা সৈয়দ হক। এক আনন্দঘন মুহূর্তে একসাথে দুজন।



কোয়ান্টাম শিশুসদনের কন্যাশিশুদের আবৃত্তি শুনছেন লেখক-দম্পতি



আনোয়ারা সৈয়দ হকের ৭৫ তম জন্মদিন উদযাপনের বিশেষ মুহূর্তে, ফুদে কোয়ান্টামদের সাথে, ৫ নভেম্বর ২০১৫

কোয়ান্টাম বুলেটিন : বিশেষ সংখ্যা, অক্টোবর ২০১৬ ॥ সম্পাদক : অধ্যাপিকা খাদিজা মাহতাব ॥ নাহার আল বোখারী, মহাপরিচালক, কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন কর্তৃক ৩১/৩ শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন সড়ক, শান্তিনগর, ঢাকা-১২১৭ থেকে প্রকাশিত ও উইভোজ প্রিন্টিং সেন্টার থেকে মুদ্রিত ॥ **গুণভেদ্য মূল্য - ৫ টাকা**
Phone : 9341441, 8319377, 9355756 Mobile : 01714-974333, 01711-671858, 09613-002025 ■ E-mail : bulletin@quantummethod.org.bd